৮-০৩

সংস্কৃতি ঃ অধ্যয়নের বিষয় না মাধ্যম ?

প্রশান্ত ত্রিপুরা*

সংস্কৃতি প্রত্যয়টি নৃতাত্ত্বিক আলোচনার দিক ও পরিধি নির্ধারণে একটি নিয়ামক ভূমিকা পালন করে এসেছে। প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞান চর্চায় ঢোকার সাথে সাথে শিক্ষানবীশরা দেখতে পায় সংস্কৃতি হল এখানকার কর্মকান্ডের ক্ষেত্র এবং বাহন। স্বভাবতঃই অনিবার্য প্রশ্নটি এসে যায়ঃ সংস্কৃতি কি? নৃবিজ্ঞান চর্চার সবদিক জুড়ে, বিশেষ করে এর লক্ষ্য, পরিধি ও অর্থকে ঘিরে, রয়েছে এই প্রশ্ন।

যেমন নামের ব্যুৎপত্তিই নির্দেশ করে, নৃবিজ্ঞান চর্চার মূল লক্ষ্য হল মানুষ, কিন্তু নৃবিজ্ঞানীরা সাথে সাথে যোগ করবেন, 'মানুষের সংস্কৃতি।' প্রকৃতপক্ষে মানুষ ও সংস্কৃতি প্রত্যয়গুলি একটি অন্যটিকে নির্দেশ করে (যদিও বানর শ্রেণীর কিছু কিছু প্রাণীর ক্ষেত্রেও কেউ কেউ সংস্কৃতির প্রাথমিক নমুনা দেখতে পান[১]), তাই বাহুল্য এড়ানোর জন্য শুধুমাত্র সংস্কৃতির উপরই বেশী নজর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এর ফলে মানুষ প্রায় হারিয়ে গেছে নৃবিজ্ঞানের আলোচনা থেকে, কারণ সংস্কৃতি নিজে নিজেই যেন অর্থপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে যেখানে 'মানুষ' এর উপস্থিতি নিতান্তই একটা গৌণ ব্যাপার, আর সংস্কৃতির আবরণ ছাড়া মানুষকে খুঁজেই পাওয়া যায় না। এসবের প্রেক্ষাপটে কিছু বৃত্তচারী সংজ্ঞা ও হেঁয়ালীতুল্য সম্পর্কের আবর্তের মধ্যে ঘুরপাক না খেয়ে মানুষ ও সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করা প্রায়

---

* প্রভাষক, নৃবিজ্ঞান বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

অসম্ভব একটা ব্যাপার। সংস্কৃতি প্রত্যয়ের উপর লিখতে যাওয়া মানে তাই একটা পুরনো সমস্যার উত্তরাধিকার মেনে নেওয়া, এবং সুনির্দিষ্ট কোন মীমাংসায় পৌঁছানোর সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও একটা সুরাহার চেষ্টা করা।

সংস্কৃতির নৃতাত্ত্বিক ধারণা গড়ে ওঠে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রসারের সময়, যখন মানবতার ধারণাকে বিশ্বজনীন একটা রূপ দেওয়ার প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যগুলোর বিজিত জনগোষ্ঠীরা যে মানুষ, এই স্বীকৃতিটা ইউরোপীয়রা বেশীদিন ঠেকিয়ে রাখতে পারে নি। কিন্তু কি ধরনের মানুষ তারা? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে ইউরোপীয় চিন্তাবিদরা সংস্কৃতির তৎকালীন প্রচলিত ধারণাকে প্রয়োগ করলেন। তাঁদের কাছে তখন সংস্কৃতি আর সভ্যতা ছিল সমার্থক, যেগুলোর বিকাশের তারতম্য দিয়ে মানবতার বিভিন্ন ধাপ তাঁরা চিহ্নিত করেছিলেন। ইউরোপীয়দের ধারণায় সংস্কৃতির উচ্চতম শিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন তাঁরা নিজেরাই, কিন্তু ইউরোপীয় জ্ঞান ও মননশীলতার দিগন্ত প্রসারিত হওয়ার কারণে সংস্কৃতি ও মানবতার এই উল্লম্ব রূপায়ন বেশীদিন প্রশ্নাতীত থাকে নি। সংস্কৃতির একরৈখিক প্রগতিবাদী ধারণার বদলে ক্রমশঃ প্রতিষ্ঠিত হল বহু সংস্কৃতির ধারণা, যে পরিবর্তনে বোয়াস মূখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন[২]। প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীরই যে নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, এবং অন্যের সংস্কৃতি ভিন্ন হলেও নগণ্য যে নয়, নৃবিজ্ঞানের এই আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী বোয়াসই জোর দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

বোয়াসের একজন ছাত্র সাপির সংস্কৃতির পূর্বতন ধারণায় সভ্য মানুষরা নিজেদের যে স্বরূপ কল্পনা করেছিল, তার মধ্যে মূলতঃ সারগর্ভহীনতাই দেখতে পেয়েছিলেন। আগে যেখানে সভ্যতার বিকাশ দিয়ে সংস্কৃতির গুণগত মান বিচার করা হত, সাপির সেখানে 'খাঁটি সংস্কৃতির ধারণা দিয়ে সভ্যতাকে মুল্যায়ন করার চেষ্টাকরলেন।[৩] তাঁর নূতন প্রত্যয়ীকরণের ফলে আগে যারা সংস্কৃতি ও সভ্যতার সর্বোচ্চ দাবীদার ছিল, তাদেরই এখন 'খাঁটি সংস্কৃতি'র মাপকাঠিতে দীন হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিল। সাপিরের 'খাঁটি সংস্কৃতি'র সাথে সভ্যতার কোন প্রয়োজনীয় সম্পর্ক ছিল না, বরং এটির মাপকাঠি ছিল মানুষের সামাজিক

আচরণের সামঞ্জস্য এবং সমাজের সদস্যদের মধ্যে অর্থপূর্ণ ভাব-বিনিময়ের গভীরতা। এই হিসাবে ইউরোপীয়দের তুলনায় তাদের বিজিত 'বন্য' বা 'বর্বর' মানুষরাই অনেক ক্ষেত্রে খাঁটি সংস্কৃতির অধিকারী ছিল। এখানে যে ব্যাপারটি ঘটছিল তা হল এই, একটি আদর্শ 'অন্য'-এর ধারণা পাশ্চত্যের মানুষরা গড়ের তুলছিল সেইসব উপাদানকে জড়ো করে যেগুলোর অভাব তারা নিজেদের সমাজে বোধকরছিল।

সাপিরের খাঁটি সংস্কৃতির ধারণায় আমরা এক ধরনের মার্ক্সীয় ইউটোপিয়ার আভাস পাই। পশ্চিমা পুঁজিবাদী সমাজের শোষণ, শ্রেণীদ্বন্দ্ব ইত্যাদির একটি বিকল্প হিসাবে মার্ক্স কল্পনা করেছিলেন আদর্শ একটি সাম্যবাদী সমাজ যেখানে ব্যক্তিদের সামাজিক অস্তিত্ব খন্ডিত নয়। সাপির যে ধরনের খাঁটি সংস্কৃতির কথা বলছেন, সেখানে সমাজের সদস্যদের মধ্যে দ্বন্দ্বের বদলে রয়েছে আত্মিক বন্ধন এবং সেখানে সংস্কৃতির উপাদানগুলো সবার কাছেই সমান অর্থবহ। সাপিরের ধারণাগুলোতে যদিও মার্ক্সীয় বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অনুপস্থিত, তবুও তাঁর খাঁটি সংস্কৃতির ধারণা মার্ক্সের আদর্শ সাম্যবাদী সমাজের কল্পনা থেকে খুব বেশী দূরে নয়। যাহোক, নৃবিজ্ঞানে সংস্কৃতি সম্পর্কিত আলোচনা সরাসরি মার্ক্সীয় ধারায় চালিত হতে আরও দেরী ছিল, সাহলিনস-এর মত ব্যক্তিরা পরে যেমনটা করেছিলেন।

ইতিমধ্যে অনুমান-নির্ভর বিবর্তনবাদী আলোচনার জায়গায় সংস্কৃতির বিভিন্ন একক রূপ ও সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অনুধাবন/বিশ্লেষণই নৃবিজ্ঞান চর্চার মুল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর যখন দেখা গেল, সংস্কৃতিই হল সেই জিনিস যা নৃবিজ্ঞান চর্চাকে অনন্যতা দিতে পারে, তখন নৃতাত্ত্বিক আলোচনার অনেকটাই হয়ে গেল সংস্কৃতির বিভিন্ন সংজ্ঞা ও মডেল দাঁড় করানোর প্রচেষ্টা। কিন্তু এটি একটি গোলমেলে কাজ যেহেতু সংস্কৃতির যে কোন মডেলকেই কোন না কোন সাংস্কৃতিক ধ্যান ধারণার উপরেই দাঁড়াতে হবে। অনেক নৃবিজ্ঞানীর কাছেই এটি একটি মৌলিক সমস্যা যেটাকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই। আর তাই, উদাহরণ স্বরূপ, ক্লাকহনকে আমরা দেখি এ সমস্যাকে বাগে আনার চেষ্টা করতে। তাঁর

মতে সংস্কৃতির কিছু বিশ্বজনীন একক নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে এই অর্থে যে মানুষ মাত্রই সর্বত্র কিছু 'জৈবিক, মানসিক এবং সামাজিক অবস্থাগত ধ্রুবক' দ্বারা পরিচালিত হয়।[৪]

সংস্কৃতি আসলেই 'প্রাকৃতিক' কিছু নিয়ম–নীতির প্রকাশ হতে পারে, কিন্তু সেই বিশ্বজনীন একক গুলোকে কিভাবে সংস্কৃতির বিবিধ রূপ থেকে বাছাই করে চিহ্নিত করা যাবে, সে প্রশ্ন থেকেই যায়। সংস্কৃতিকে, ধরা যাক, ভাষার মত করে কি দেখা যায়? এগুলো কি একই ধরনের ব্যবস্থা বা প্রপঞ্চ? গুডেনাফ এবং তাঁর মত আরও অনেকের উত্তর এক্ষেত্রে ইতিবাচক। গুডেনাফ সংস্কৃতিকে একটি আদর্শিক ব্যবস্থা হিসাবে দেখেন–"আদর্শ আচরণবিধির একটি ব্যবস্থা", যেটির উপস্থিতি রয়েছে ব্যক্তিদের "চেতনায় এবং মননে।"[৫] বেইটসনও অনেকটা একই দৃষ্টিভঙ্গীই প্রকাশ করেন যখন তিনি সংস্কৃতির eidos ও ethos–এর কথা বলেন। প্রথমটির ক্ষেত্রে ধ্যান ধারণা ও চিন্তাধারার একটি আদর্শায়িত ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে, এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে আবেগ, অনুভূতি ও উপলব্ধির ব্যবস্থার কথা। কিন্তু সংস্কৃতিকে একটি ব্যবস্থা হিসাবে দেখার মধ্য দিয়ে এর অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়াগুলো সম্পর্কে বিশেষ কোন ধারণা অর্জন করা যায় না। এক্ষেত্রে বেইটসনের 'নাভেন' (Naven) নামক গ্রন্থটিকে সংস্কৃতির প্রত্যয়ীকরণের সাথে সম্পর্কিত এ ধরনের সমস্যার একটি বিবরণ হিসাবে বিবেচনা করা যায়।[৬]

বেইটসন বর্তমান পাপুয়া নিউ গিনির ইয়াটমুল নামের এক জনগোষ্ঠীর উপর কাজ করেছিলেন। তিনি এই ধারণা নিয়ে কাজে নেমেছিলেন যে ইয়াটমুল সংস্কৃতি বলে কিছু একটা আছে। কিন্তু, তাঁর বক্তব্য মতে, তাঁর কোন পূর্ব নির্ধারিত ধারণা ছিল না এই সংস্কৃতিকে এর সামগ্রিকতায় অনুধাবন করার জন্য কি কি জিনিসের উপর নজর দিতে হবে। কিছুটা এলোমেলো ভাবে যথেষ্ট পরিমাণ পর্যবেক্ষণ লিপিবদ্ধ করার পর বেইটসন তাঁর সংগৃহীত তথ্যে নকশা এবং নিয়মের খোঁজ করতে শুরু করেন। এখন তাঁর কাজ দাঁড়াল ইয়াটমুল সংস্কৃতির একটা মডেল তৈরী করা এবং সংস্কৃতিটা কিভাবে ক্রিয়া করে তা বোঝার চেষ্টা করা। এইভাবে এগুলোর পর বেইটসন একটা সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব অনুধাবন করেন,

যেটাকে তিনি Schismogenesis আখ্যা দিয়েছেন, এবং যেটার মাধ্যমে তিনি ইয়াটমুল সংস্কৃতিকে দেখতে পান গতিশীল একটা ভারসাম্যের মধ্যে থাকা একটি ব্যবস্থা হিসাবে, যেখানে গতিশীলতাটা হল ব্যক্তিদের মধ্যে মিথস্ক্রিয়ার ফল। বেইটসন ইয়াটমুল সংস্কৃতিকে যতটুকু বুঝতে পেরেছিলেন, এর বেশীর ভাগই ছিল নাভেন নামক একটি আচারকে অনুধাবনের মাধ্যমে। আদর্শায়িত বা রীতিসিদ্ধ আচরণ, অনুভূতি এবং চিন্তার সাক্ষাত পাওয়ার জন্য এই আচারটি একটি প্রেক্ষাপট হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল বেইটসনের কাছে। নিজের অভিজ্ঞতা পর্যালোচনা করতে গিয়ে তিনি দেখতে পান, আচারটা ছিল একাধারে আচরণের রীতিসিদ্ধকরণের উপায় এবং এর রীতিসিদ্ধতার প্রকাশ।

দেখা যাচ্ছে, কোন সংস্কৃতিকে বোঝার এবং অনুভব করার জন্য সে সংস্কৃতির বিভিন্ন আচার খুবই সহায়ক। কারণ আচারসমূহে সংস্কৃতির বিভিন্ন প্রতীক, সেগুলোর যথাযথ ব্যবহার এবং অর্থ পর্যবেক্ষকের সামনে একসাথে হাজির হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে টার্নার মনে করিয়ে দেন যে সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াদির আলোচনা যথার্থ মনস্তাত্বিক ভাষায় করতে গেলে তা নৃবিজ্ঞানের সমসাময়িক সামর্থ্যের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে।[৭] তাই প্রয়োজনের খাতিরেই অনেক নৃবিজ্ঞানী শুধুমাত্র প্রতীকের পর্যায়ে তাঁদের মনোযোগ সীমাবদ্ধ রাখেন। এইভাবে সংস্কৃতিকে একটি 'প্রতীকী ব্যবস্থা' হিসাবে চিহ্নিত করার ধারা নৃবিজ্ঞানে সূচিত হয়। বিভিন্ন সামাজিক আচার হচ্ছে সেই প্রক্রিয়াসমূহ যেখানে প্রতীক সাংস্কৃতিক অস্তিত্বের ব্যক্তিক ও সামাজিক প্রান্তদ্বয়ের মধ্যে মধ্যস্থতা করে। এভাবে দেখার ফলে নৃবিজ্ঞানীদের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়াল সংস্কৃতির প্রতীক সমূহের পাঠ উদ্ধার।

আলোচনার এই পর্যায়ে এসে নৃবিজ্ঞান চর্চার উদ্দেশ্য ও অর্থ নিয়ে প্রশ্ন করাটা প্রাসঙ্গিক, এমনকি অপরিহার্য, হয়ে দাঁড়ায়। কারণ নৃবিজ্ঞানের গোড়ার বিষয় 'মানুষ'কে এখন প্রতীকের অরণ্যে (টার্নারের উপমা) খুঁজতে হয়, এবং দেখা যায় সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়াই ভার। নৃবিজ্ঞানের দৃষ্টি থেকে মানুষের অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার কারণ কিছুটা এটাও যে মানুষ নিজেই একটা প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়, যে প্রতীককে নৃবিজ্ঞানী তাঁর প্রয়োজন ও সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করেন। এই

প্রেক্ষাপটে নৃবিজ্ঞানের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক বিষয়ে অজের আলোচনা তাৎপর্যপূর্ণ।[৮]

অজের মতে নৃবিজ্ঞান এক অর্থে ইতিহাসের অন্তর্গত। যেমন, এর অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছে ঔপনিবেশিকতার কারণে। আবার আর এক অর্থে এটি ইতিহাসের বাইরে। যেমন, যে সমস্ত বিষয় নিয়ে এখানে বিতর্ক চলে–অর্থ বনাম ক্রিয়া, বিবর্তন বনাম ব্যাপ্তি, ইত্যাদি–সেগুলো প্রকৃত পক্ষে মীমাংসার অতীত, এবং এ বিতর্কে অন্যান্য সমাজ সংস্কৃতিকে টেনে আনা হয় তাদের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে উপেক্ষা করে। এই সমস্যার পেছনে একটি প্রধান কারণ হল নৃবিজ্ঞান চর্চার প্রকৃত বিষয় বরাবরই ছিল পাশ্চত্য নিজেই, 'অন্য' অর্থাৎ অপাশ্চত্য নয়। এখানে 'অন্য'কে মানবতার প্রতিভূ হিসাবে এমনভাবে প্রতীকায়িত করা হয় যাতে সেটিকে বিতর্কে ব্যবহার করা যায়, সেই বিতর্ক যেটি মূলতঃ পাশ্চত্যের বুদ্ধিজীবিদের কাছেই অর্থবহ, এবং যেটি (অন্ততঃ ফ্রান্সে) একটি মার্কসীয় ভেদরেখা ধরে এগিয়েছে। যখন আমরা নৃবিজ্ঞানকে এভাবে বিচার করি, তখন এটি কোন রহস্যের ব্যাপার থাকে না যে আজকাল পাশ্চত্যের নৃবিজ্ঞানীরা ক্রমবর্ধমান হারে নিজেদের সমাজ নিয়ে আলোচনা করছেন। এ হল নৃবিজ্ঞানের ঘরেফেরা।

নৃবিজ্ঞানের এই ফিরতি অভিযাত্রায় সংস্কৃতি প্রত্যয়টি কি ভূমিকা পেয়েছে? আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সামাজিক বাস্তবতার আলোচনায় এটি ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন গিয়ার্টজ মতাদর্শের উপর আলোচনা করতে গিয়ে এটিকে একটি সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।[৯] তবে মজার ব্যাপার হল, আমরা স্মরণ করতে পারি, 'সংস্কৃতি ' প্রত্যয়টি একসময় নিজেই একটা মতাদর্শ ছিল, যখন এটি সভ্যতার সমার্থক ছিল, যখন ইউরোপের অভিজাত শ্রেণীই সংস্কৃতির সর্বোচ্চ দাবীদার ছিল। প্রকৃতপক্ষে, সংস্কৃতি সম্পর্কে আধুনিক নৃবিজ্ঞানীদের ধারণাসমূহও কোন না কোন মতাদর্শের প্রতিফলন নয়, সে কথা আমরা জোর দিয়ে বলতে পারি না। এক্ষেত্রে প্রশ্ন তোলা যায়, নৃবিজ্ঞান কতটুকু বিজ্ঞান আর কতটুকু মতাদর্শ? মতাদর্শের আলোচনায় গিয়ার্টজ যখন বলেন যে

"মতাদর্শের বক্তব্য বা দাবীসমূহের যাচাইয়ের ভার বিজ্ঞানের হাতে ন্যস্ত",[১০] তখন এটা পরিস্কার হয় না মতাদর্শ ও বিজ্ঞানের মধ্যে সীমারেখাটা আমরা কোথায় টানব। এ ক্ষেত্রে আর এক নৃবিজ্ঞানী, ব্লক,–এর বক্তব্য অনেক বেশী সরাসরি ঃ ''অন্যান্য বিজ্ঞানীদের মত নৃবিজ্ঞানীরাও, সচেতনভাবে হোক বা না হোক, রাজনীতিতে পক্ষ নিচ্ছেন, এবং এ বিষয়টাকে উপেক্ষা করার প্রচেষ্টা মূলতঃ পরোক্ষভাবে আধিপত্যকারী শ্রেণীকে সমর্থন যোগানোই হয়ে দাঁড়ায়।"[১১] এখানে আমরা একটি মার্ক্সীয় দৃষ্টিভঙ্গী দেখতে পাচ্ছি স্পষ্টভাবে।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে নৃবিজ্ঞানীদের অনেকেই মার্ক্স কর্তৃক নিরূপিত বিতর্কের নাগাল পাওয়ার চেষ্টা করেছেন বিভিন্ন ভাবে। কিন্তু মার্ক্সীয় বিতর্ক মুলতঃ পাশ্চাত্যের পুঁজিবাদী সমাজকে নিয়েই, অন্যদিকে নৃবিজ্ঞানীরা এতদিন পাশ্চাত্যের বাইরে তথাকথিত প্রাক–পুঁজিবাদী সমাজসমূহের উপরেই তাঁদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। কাজেই বিষয়গত এবং প্রত্যয়গত কিছু সম্পর্ক পুনর্স্থাপন করার প্রয়োজন আছে। এক্ষেত্রে সাহ্‌লিনস এর প্রস্তাবিত পন্থা হচ্ছে পাশ্চাত্যের সমাজকে 'সংস্কৃতি' হিসাবে দেখা। তাঁর মতে, পুঁজিবাদী সমাজ এবং উপজাতীয় সমাজ যদিও আলাদা আলাদা সামাজিক লেনদেনের বলয় বেছে নিয়েছে (যথাক্রমে অর্থনীতি এবং জ্ঞাতি সম্পর্ক), উভয় ক্ষেত্রেই এই লেনদেনগুলো একটা প্রতীকী ব্যবস্থা অর্থাৎ সংস্কৃতির মধ্যস্থতায়ই সম্পন্ন হয়। সুতরাং সংস্কৃতি প্রত্যয়টির ব্যবহারের মাধ্যমে নৃবিজ্ঞানীরা মার্ক্সীয় বিতর্কে স্বকীয় অবদান রাখতে পারেন।

নৃবিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সংস্কৃতি প্রত্যয়টির এই নিরবচ্ছিন্ন উপস্থিতি এই ধারণা দেয় যে নৃবিজ্ঞান অবশেষে একান্ত নিজস্ব একটি অধ্যয়নের বিষয় চিহ্নিত করতে পেরেছে। কিন্তু বাস্তবে এইরকম একটি সুনিশ্চিত বিশ্বাসের অবকাশ এখনও ঘটেনি। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সংস্কৃতি প্রত্যয়টি একটা আবর্তের মধ্যেই ঘুরপাক খেয়েছে। সংস্কৃতি প্রথমে ছিল পাশ্চাত্যের অভিজাত শ্রেনীর একচেটিয়া দখলে, পরে এই সংকীর্ণ গন্ডী থেকে মুক্ত করে সংস্কৃতি প্রত্যয়কে মানবতার ব্যাপ্তি ও গভীরতা অনুধাবনের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। তা করতে গিয়ে সংস্কৃতি কি, পৃথিবীর বিভিন্ন সংস্কৃতির স্বরূপ কি, এসব

করাই নৃবিজ্ঞানীদের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। এবং দীর্ঘ পরিক্রমার পর ইদানীং সংস্কৃতি আবার পাশ্চাত্যের সমাজকে বিশ্লেষণের একটি হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। সন্দেহ নেই, সংস্কৃতি সম্পর্কে নৃবিজ্ঞানীদের ধারণা অনেক বেশী পরিশীলিত হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই না যে সংস্কৃতি সম্পর্কে সব ধারণাই এখন স্বচ্ছ হয়ে গেছে, বা প্রত্যয়টির ভূমিকা নৃবিজ্ঞান চর্চায় কি হবে, তা চূড়ান্তভাবে স্থির হয়েছে। সংস্কৃতির সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা কেউ যথেষ্ট সন্তোষজনক ভাবে দিতে পেরেছেন, এমন না, কিন্তু এ অবস্থাতেই সংস্কৃতি নিজেই আজকাল অন্যান্য সম্পর্কিত বিষয়কে সংজ্ঞায়িত করে, ব্যাখ্যা করে।

সবশেষে যে প্রশ্ন না ওঠালেই নয় সেটা হল, সংস্কৃতিকে একই সাথে অধ্যয়নের বিষয় এবং মাধ্যম করে নৃবিজ্ঞান যথেষ্ট পথ পাড়ি দিয়ে এসেছে, কিন্তু নৃবিজ্ঞান চর্চার মুলে যে প্রশ্ন, মানুষ কি ও কেন, তার উত্তর কতটুকু আমরা পেয়েছি? প্রাতিষ্ঠানিক নৃবিজ্ঞান চর্চার পরিসরে এ প্রশ্নের উত্তর আশা করা হয়ত ঠিক হবে না। কারণ সংস্কৃতি দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করা যায় না, যাবে না, যেহেতু সংস্কৃতি সম্পর্কে কোন নৃবিজ্ঞানীর ধারণাই পুরোপুরি নিজ সংস্কৃতির ধ্যান ধারণার প্রভাবমুক্ত থাকতে পারে না।

এক্ষেত্রে মানুষ কি ও কেন, এটা নিবিড় ভাবে বোঝার জন্য নৃবিজ্ঞানীরা যে কাজটি করতে পারেন তা হল তাঁরা নিজেরাও যে মানবতার অংশ, সে উপলব্ধিকে স্বীকৃতি দেওয়া। এ কাজটি করা না হলে নৃবিজ্ঞানের মুল যে বিষয়, মানবতা, সেটি একটা প্রতীক হয়েই থাকবে নৃবিজ্ঞানীদের নিজস্ব প্রতীকী ব্যবস্থার মধ্যে।

তথ্যনির্দেশঃ

১. Harris, M., *Cultural Anthropology*, 1983, P. 21

২. Goodenough, W., *Culture, Language and Society* Menlo Park, Ca : Cummings PubI, 1981, P. 41

৩. Sapir, E., "Culture : Genuine and Spurious" in D. Mandelbaum, ed., *Selected Writings of Edward Sapir*, 1951 (1924).

৪. Kluckhon, C. "Universal categories of culture" in A.L. Kroeber, ed., *Anthropology Today* , 1953, P. 517

৫. Goodenough, W., op. cit., PP. 51-57

৬. Bateson, G., *Naven*, Stanford : Stanford Univ. Press 1958

৭. Turner, V., *The Forest of Symbols* Ithaca : Cornell Univ. Press, 1967

৮. Augé, M., *The Anthropological Circle,* New York : Cambridge Univ. Press, 1982

৯. Geertz, C. , "Ideology as a cultural system" in *Interpretation of Cultural,* New York: Basic Books, 1973.

১০. Ibid, P. 232.

১১. Bloch, M., *Marxism and Anthropology,* Oxford : Oxford Univ. Press, 1985

১২. Sahlins, M., *Culture and Practical Reason,* Chicago : Univ. of Chicago Press, 1976.